Website: https://www.parthasarathipatrika.com

:: ২১ তম অন্তর্জাল সংখ্যা ::

৮ই পৌষ, ১৪২৮ / 24.12.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
একখানি চিঠি	শ্রী অরবিন্দ
শ্রী গুরুর সান্নিধ্যে	শ্রী পারিজাত কুসুম সাহা
দাসত্বের কাল	সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি কণা

"পরম শ্রদ্ধার বিকাশ তখনই, যখন সমস্ত কিছুর মধ্যেই আমরা ঈশ্বর কে অনুভব করব, প্রত্যক্ষ করব। যখন আমাদের দৃষ্টিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ সত্তার প্রকাশ, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি কর্মে, প্রকৃতির সকল সমগ্রতায় ঈশ্বরের উপলব্ধি – তখনই যোগ হয়ে ওঠে পূর্ণতম।"

DO NOT COPY

(15.10.1936 - 24.10.2019)

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ সংখ্যার পার্থসারথি একটু ঝড়ের সঙ্কেত নিয়ে প্রকাশিত হল। শুনলাম আমার অনেক শত্রু বেড়ে যাচ্ছে। আমার আবার শত্রু অথবা মিত্র কে ছিল? চিত্রা এলো একদিন দেখা করতে। তার মুখের দিকে তাকাতেই এক গাল হেসে বলল– "লেখাটা আমার বেশ ভাল লেগেছে। আমার গায়ে লাগবার কোন কারণ নেই। যারা এ ব্যাপারে জড়িত তাদের গায়ে লাগবে।..."

আমার এ বিষয়ে একটু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আছে। শ্রীপ্রীতিকুমার যত অসাধারণ ব্যক্তি হোন না কেন, তিনি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি দীর্ঘ তিরিশ একত্রিশ বছর ধরে স্ত্রী পুত্র সহ সংসার করেছেন। সাধারণ ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর জীবনে আসতোই। অনেকেই তাঁর নীরবতা, সহনশীলতাকে কাজে লাগিয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন। যা ঘটবে তা তিনি আগেই বলে দিতেন, কিন্তু ঘটনা ঘটবার পর আমাদের সাথে সমান ভাবে ব্যথিত হতেন। কত রকমের লোক তাঁর কাছে এসেছেন। তাঁর নিজের তথাকথিত আপনজনদের ব্যবহারের কত তারতম্য ঘটেছে যখন তাদের চাহিদা পূরণ হয়নি। শ্রীপ্রীতিকুমার সম্বন্ধে লিখতে গেলে স্বভাবতই তাদের কথা এসে পড়ে। এটা আমার বিদ্বেষ প্রকাশ নয়। আমি "পার্থসারথি" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপ্রীতিকুমারের ব্যক্তিগত জীবনের ছবিটা তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। যারা মনে করছেন তাদের স্বরূপটা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে, তাদের প্রতি আমি দুঃখ জ্ঞাপন করছি। একজন সাধকের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী প্রকাশ করতে গেলে সব উল্লিখিত ঘটনা সবার পছন্দ নাও হতে পারে। তার জন্য আমি দুঃখিত। চিত্রার মত হাসিমুখে গ্রহণ করবার পাঠকও তো আছেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি

DO NOT COPY

শ্রীপ্রীতিকুমারের ব্যক্তিগত জীবনটা তুলে ধরবার জন্য উৎসাহিত করেছেন আমাকে। তাই আমার স্মৃতিচারণ।

তাঁর চরিত্রের যে গুণটি আমার চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল – সেটা হল শৃঙ্খলাবোধ। একটি জিনিষ এদিক ওদিক হতো না। যেখানকার জিনিষ সেখানেই রাখতে হতো, যেটা আমার বা বাপীর একেবারেই রপ্ত নয়। আমি বরং দু'বছরে অনেক ভাবে গুছিয়ে কাজ করতে চেষ্টা করছি। এখন আমার খুব কষ্ট হয় তিনি থাকতে কেন এমন সুন্দর করে গুছিয়ে কাজ করিনি! আসলে সদা সর্বদা একটি নির্ভরতা বোধ কাজ করতো। মনে হতো, উনি আছেন তো! উনি আমাদের রক্ষা করবেন। আমরা আজও সেই বিশ্বাসের জোরে বেঁচে আছি।

শ্রীপ্রীতিকুমার খুব গান ভালবাসতেন। নীরেন দা (শ্রী নীরেন মৈত্র) তাঁকে স্মরণ করে কয়েকবার বাড়িতে গানের আসরের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি থাকতে অনেক ক্যাসেট এনে দিয়েছেন। আমাকে শ্রীপ্রীতিকুমার বহু বছর ধরে গান শেখাবার চেষ্টা করেছেন। এবং কোনদিনও গানের মাষ্টার মশাইয়ের টাকা আমাকে দিতে হয়নি। আমার বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর আমার গান শেখা শুরু হল। শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষের ছোট ভাই শ্রী দ্বিজেন ঘোষ। তিনি ছিলেন নাছোড়বান্দা। আমাকে একটি গান না তুলিয়ে ছাড়তেন না। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করতো না একই ধরণের কাজ করতে। মাষ্টার মশাই শেষের দিকে রীতিমতো বেগুনী, আলুর চপ নিয়ে ঢুকতেন। এ নিয়ে শ্রীপ্রীতিকুমার খুব রসিকতা করতেন। মাষ্টারমশাইয়ের কাছে তিনি Report নিতেন কতদূর Progress হলো। একদিন আমি নিজেই মাষ্টার মশাইকে গান শেখবার অনিচ্ছা ব্যক্ত করাতে তিনি সোজা শ্যামবাজারের শ্রীপ্রীতিকুমারের কর্মস্থলে হাজির হয়ে আমার নামে নালিশ করেছিলেন। শ্রীপ্রীতিকুমার বাড়ি এসে আমাকে খুব বকাবকি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে গান শেখায় ইতি টেনেছিলাম।

পরবর্তী কালে আমি শ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দীর্ঘকাল গান শিখেছিলাম। ফিরে এলে রোজ জিজ্ঞাসা করতেন কি শেখা হল। তবে আমার সুরের ধ্বনি তাঁর কানে যেত না, যেত কাংস্যনিন্দিত বকাঝকার ধ্বনি এবং তাতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

আজ মনে হয় যে শান্তি তিনি চাইতেন সে শান্তি তো আমাদের বাড়িতে এখন বিরাজ করছে। তিনি কি খুশী হচ্ছেন না? তিনি কি আমাকে আশীর্বাদ করছেন না? আমিও মনে প্রাণে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি – "আমার মনকে

ভগবদ্‌মুখী কর – আমাকে সহ্য শক্তি দাও। আমাকে তোমার উপস্থিতি, তোমার করুণা অনুভব করতে দাও।”

– – – – – – – – – –

(** রচনা কালঃ জানুয়ারি, ১৯৮৯)

একখানি চিঠি **শ্রী অরবিন্দ**

৭ই এপ্রিল, ১৯২০

স্নেহের –

তোমার চিঠি পেয়েছি, এ পর্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে ওঠেনি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটা miracle (আশ্চর্য কাণ্ড), কেননা আমার চিঠি লেখা হয় once in a blue moon; বিশেষতঃ বাংলায় লেখা, যা এই পাঁচ সাত বৎসর একবারও করিনি। শেষ করে যদি post-এ দিতে পারি, তা' হ'লেই miracle-টা সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম, তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে ও তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভাগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে, তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা – যাকে পূর্ণযোগ বলি – সেই পন্থায় চলতে হবে। ... যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, লেলে যা দিয়েছিলেন ..... সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক ওদিক ঘুরে দেখা; পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটি ওটি ছোঁয়া, তোলা; হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এটির এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটির পিছনে যাওয়া।

তারপর পণ্ডিচারীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ theory যোগশরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তারই development করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয়নি, আর দুই বৎসর লাগতে পারে।

DO NOT COPY

যোগপন্থাটি কি, তা পরে লিখব; অথবা তুমি যদি এখানে আসো, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা-কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই মাত্র বলতে পারি যে, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কর্ম ও পূর্ণ ভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মন বুদ্ধিকে জানত, আর আত্মাকে জানত; মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে; অনন্ত অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না। ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক এক জন করতে পারেন বটে; কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান তো আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান, সেটি হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্তিমান করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে – to realize God in life।

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করতে পারেনি; জগতকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবন শক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেয়ু রিমে লোকাঃ ন কুর্যাং কর্ম চেদহম," ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি? আগে মানসিক level-এ যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়, তারপর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solved হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন – এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না; জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়, গীতায় যাকে বলে "সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্"। অন্নময় দেহ, প্রাণ মন বুদ্ধি বিজ্ঞান আনন্দ – এই হল আত্মার পাঁচটি ভূমি। যতই উঁচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolution-এর চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয় – দেহে, জগতে,

জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue।

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আমি এইমাত্র বিজ্ঞানের তিনটি স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে তখন ভগবান আমার through দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দেবেন, এর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্মসিদ্ধির জন্য অধীর নই। যা হবার, ভগবানের নির্দিষ্ট সময়ে হবে। উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শক্তিতে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্মসিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্যচ্যুত হব না। এ কর্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না। ভগবান যখন চালাবেন, তখন চলব।

বাংলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতন রূপ, কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এরও দরকার ছিল। বাংলা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে সেইগুলির সংস্কার exhaust করে আসল সারটি নিয়ে জমি উর্বর করছে। আগে ছিল বেদান্তের পালা – অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া, ইত্যাদি। যা এখন হচ্ছে, এইবার, বৈষ্ণব ধর্মের পালা লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে মেতে যাওয়া। এইগুলি অতি পুরাতন, নবযুগের অনুপযোগী, এসব টিঁকবে না, কারণ এরূপ উন্মাদনা টেঁকবার নয়। তবে বৈষ্ণব ভাবের এই গুণ আছে যে, ভগবানের সঙ্গে জগতের একটি সম্বন্ধ রাখে, জীবনের একটি অর্থ হয়। (কিন্তু) খণ্ডভাব বলে পূর্ণ সম্বন্ধ, পূর্ণ অর্থ নাই। যে দলাদলির ভাব লক্ষ্য করেছ সেটি অনিবার্য। মনের ধর্ম – এই খণ্ডকে নিয়ে পূর্ণ বলা, আর-সকল খণ্ডকে বহিষ্কৃত করা। যে সিদ্ধ (পুরুষ) ভাবটি নিয়ে আসেন, তিনি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন – (পূর্ণকে) মূর্ত করতে না পারলেও। (কিন্তু) শিষ্যরা তা পারেনা, (গুরুতে তত্ত্বটি) মূর্ত নয় বলে। পুঁটলি বাঁধছে বাঁধুক, দেশে ভগবান যেদিন পূর্ণ অবতীর্ণ হবেন, সেদিন পুঁটলি আপনি খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতার, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ। তাতে বিচলিত হইনে। অধ্যাত্মভাব খেলুক দেশে, যে ভাবেই হোক, যত দলেই হোক, – পরে দেখা যাবে। এটি নবযুগের শৈশব, এমনকি embryonic অবস্থা। আভাস মাত্র, আরম্ভ নয়।

এই যোগের বিশিষ্টতা এই যে, সিদ্ধি একটু উপরে না উঠলে ভিত্তিও পাকা হয় না, (আমার যোগের) যারা সাধন করছে, তাদের আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটি খসেছে, কয়েকটি এখনও আছে। আগে (তোমাদের) ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার, অরবিন্দ-মঠ করতে চেয়েছিলে; এখন (তোমাদের) বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, (কিন্তু) প্রাণে সেই পুরাতনের ছাপ এখনও একেবারে মুছে যায় নি। সেই জন্য সংসারে থেকে ত্যাগী সংসারী হতে বল। তোমরা কামনা ত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছ, কিন্তু কামনাত্যাগ আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ধরতে পারনি। আর আমার যোগটা নিয়েছিলে, যেমন বাঙালীর সাধারণ স্বভাব – জ্ঞানের দিক থেকে তেমন নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্মের দিকে। জ্ঞান কিছু হয়েছে, অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়াশা dissipated হয়নি- কাটেনি। তোমরা সাত্ত্বিকতার গণ্ডী পুরামাত্রায় কাটাতে পারনি, অহং এখনও রয়েছে; এক কথায় তার development হয়নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নেই, আমি তোমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে develop করতে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে ঢালতে চাই নে, আসল জিনিসটাই সকলের মধ্যে এক হবে, নানাভাবে নানা মূর্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর থেকে grow করছে, গড়ে উঠছে। বাহির থেকে গঠন করতে চাইনে। তোমরা মূলটি পেয়েছ, আর সব আসবে।

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ – আত্মার ঐক্যের মূর্তি - সঙ্ঘ চাই। এই idea বা ভাবকে নিয়েই দেবসঙ্ঘ নাম দেওয়া হয়েছে, যারা দেবজীবন চায় তাদেরই সঙ্ঘ দেবসঙ্ঘ। সেইরূপ সঙ্ঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহংয়ের ছায়া যদি পড়ে, সঙ্ঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে (শুদ্ধ) সঙ্ঘ শেষে দেখা দেবে এইটিই তাই, (যেন) সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাহিরে তারা ভিতরকার লোক নয়, (অথবা ভিতরকার) হলেও তারা ভ্রান্ত, আমাদের যে বর্তমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না বলেই।

তুমি হয়ত বলবে, সঙ্ঘের কি দরকার? মুক্ত হয়ে সর্বঘটে থাকব; সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যেই যা হয়। সে সত্যি কথা; কিন্তু (তা হচ্ছে) সত্যের একটি দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে; আবার মূর্তি ভিন্ন জীবনের effective (কার্যকরী) গতি নেই। অরূপ যে মূর্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার

খামখেয়ালি নয়; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ, আমরা জগতের কোনও কাজ বাদ দিতে চাই না; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে; বিলাতী আমদানি, বিলাতী ঢঙের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি; না করলে দেশ উঠত না; আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) লাভ ও পূর্ণ development (বিকাশ) হতো না। এখনও তার দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম তারই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise করতে চায় ..... তার ফল হবে, যদি কোনও স্থায়ী ফল হয়, এক রকম Indianised Bolshevism। সে রকম কর্মেও আমার আপত্তি নেই; যাঁর যে প্রেরণা তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয়; অশুদ্ধ রূপে spiritual শক্তি; ঢাললে কাঁচা ঘটে উদধির জল – হয় ঐ কাঁচা জিনিসটা ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে; সর্বক্ষেত্রেই তাই। Spiritual influence দিতে পারি, তবে সেই শক্তি expended হবে শিব মন্দিরে বানরের মূর্তি গড়ে স্থাপন করতে। বানরটি প্রাণ প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয়তো করবে, যতদিন সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারত মন্দিরে চাই হনুমান নয়- দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিলতে পারি – কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্য, আমাদের আদর্শের spirit ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তা না করলে দিশেহারা হব, প্রকৃত কর্ম হবে না। Individually সর্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সঙ্ঘরূপে সর্বত্র থেকে তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসেনি। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা' চাই তা' হবে না। সঙ্ঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ। যারা আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে কাজ করবে; পরে Spiritual commune-এর মত রূপ দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সব কর্মকে আত্মানুরূপ যুগানুরূপ আকৃতি দেবে। শক্ত বাঁধা রূপ নয়, অচলায়তন নয়; স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা ছড়িয়ে যেতে পারে নানা ভঙ্গী লয়ে এটিকে ঘিরে, ওটিকে প্লাবিত করে, সব

আত্মসাৎ করবে; করতে করতে spiritual community দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্তমান idea, এখনও পুরো developed হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

তারপর তোমার পত্রের কয়েকটি বিশেষ কথায় আলোচনা করি। তোমার যোগের সম্বন্ধে যা লিখেছ, সে সম্বন্ধে এই পত্রে বিশেষ কিছু লিখতে চাই না, দেখা হলে সুবিধা হবে। দেহকে শব দেখা সন্ন্যাসের নির্বাণ-পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সর্ব বস্তুতে আনন্দ চাই – যেমন আত্মায় তেমনই দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবান কে দেখলে, "সর্বমিদং ব্রহ্ম – বাসুদেবঃ সর্বমিতি" এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত তরঙ্গ ছোটে; এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্মে পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। (আমি নিজের মধ্যে) অনেক দিন থেকে মানসিক ভূমিতে মনের ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় করে তুলছি। এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের (Supramental) রূপ ধারণ করছে। এই অবস্থায়ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি।

দেবসঙ্ঘের কথা বলে তুমি লিখেছ – "আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শাণানো লোহা।" ... দেবতা কেহই নহে, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। বড় আধার আছে মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তারপর বড় ছোট ও সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশি বাধা হতে পারে, বেশি সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভিতরের দেবতা সেসব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না; ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল? সময় কি লাগেনি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন? দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্ত, দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানি না, তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি – ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। সকলেরই তাই। ... আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

আমি যা অনেকদিন থেকে দেখছি তার দু'একটি কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস – জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্বত্রই দেখি inability বা unwillingness to think (চিন্তা করবার অক্ষমতা অনিচ্ছা) বা চিন্তা-"ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটি ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রি কাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটি জিনিস – অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে; সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভুত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট – এ সব নবসৃষ্টির পূর্বাবস্থা।

তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giants (একক অতিকায় মহাপুরুষ) ছাড়া সর্বত্রই সোজা মানুষ অর্থাৎ average man (সাধারণ গড়পড়তা মানুষ), যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারত চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা, য়ুরোপ চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলিমজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation (অলঙ্ঘ্য সীমা) আছে। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics (কুহেলিকাময় তত্ত্বশাস্ত্র), yogic hallucination (যোগজ মতিভ্রম); ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation-ও (সীমা) surmount (অতিক্রম) করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান, এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব

পুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধর্মের গোঁড়ামি। অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ অলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাংলা দেশেই দুর্বলতার চরম অবস্থা। বাঙালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity আছে, intuition আছে, এইসব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধী-র শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তাহলে বাঙালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ, তারপর অবসাদ, তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে; শেষে বাঙালী নিজের দেশে কি হয়েছে – খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধন দৌলত, ব্যবসাবাণিজ্য, জমি, চাষ পর্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে। শক্তিসাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকেনা; সঙ্কীর্নতা, ক্ষুদ্রতা আসে, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে প্রাণে হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এদেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

আর্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁকডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত তারা, তা বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বলছ চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতানো। রাজনীতি ক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম, স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম, সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনও ফল হয়নি। হয়েছে; যত movement হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা অধিকাংশ

possibility-র বৃদ্ধি; স্থিরভাবে actualize (বাস্তবরূপদান) করবার এটি ঠিক রীতি নয়। সেইজন্য আমি আর emotional excitement (আবেগমত্ততা) ভাব, মনমাতানোকে base করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy (তীব্রানন্দ)। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র-আমিত্ব শূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture পড়ে একথা ভাববে না যে আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield (বিপরীত দিকে) কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটলি St. Peter-এর (খৃষ্টের প্রথম শিষ্য, খৃষ্টীয় স্বর্গের দ্বারী) চাদরের মধ্যে গিজগিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারি হয়নি বলে নয়, আমি তৈয়ারি হইনি বলে। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে?

ইতি
তোমার 'সেজদা'

_ _ _ _ *** শ্রী অরবিন্দ মন্দিরের সৌজন্যে

শ্রী গুরুর সান্নিধ্যে **শ্রীপারিজাত কুসুম সাহা**

আমার শ্যামবাজারে দাদার কাছে যাওয়া খুব সম্ভবতঃ ঘটেছিল ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে। স্বভাবতঃই সুধীরদার কাছে অর্থাৎ স্বর্গত সুধীর কুমার পালিতের কাছে কিছুটা ঋণী। তাঁর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার চাপে পড়ে তিনি নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্যামবাজারে প্রীতিদার সামনে, যাঁকে পরবর্তী কালে শুধু "দাদা" বলে ডাকতেই অভ্যস্ত হয়েছিলাম। সেও সম্ভব হয়েছিল দাদারই নির্দেশে। যাই হোক সুধীরদাকে কথা দিতেই হয়েছিল। প্রথম সাক্ষাতেই উপস্থিত হয়ে কিছু যেন না চাই বা না বলি। প্রয়োজনে শুধু সামান্য কিছু প্রশ্ন করা চলবে। ঘটনা প্রবাহে একদিন ৫ নং অক্ষয় বোস লেনে ঢুকে বললেন, "তুমি একটু এই রাস্তায় দাঁড়াও, আমি এক আত্মীয়ের সঙ্গে একটা কথা বলে আসছি।" তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেছিলাম, "আচ্ছা বলুন তো আপনি যাঁর কথা আমাকে প্রায়ই বলেন, তিনিই কি এই বাড়ীতেই থাকেন?" উত্তরে বলেন, "যা ধরেছ তা ঠিকই।" "তাহলে আমি একটু দেখা করতে চাই তাঁর সঙ্গে –একবার বলবেন কি?" ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জানালেন, "ঠিক আছে, তবে তুমি এই বাড়ীর সামনে রাস্তায় অপেক্ষা কর। সেই জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়ীর এক অন্ধকার গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন লক্ষ্য করছি। তখন ঐ বাড়ীর অবস্থা ঐ রকমই ছিল। যেতে না যেতেই দেখি ফিরে আসছেন আমার দিকে। এসেই বললেন যে তিনি ঘরে ঢুকতেই উনি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন, "সঙ্গে যাকে এনেছেন তাকে আবার কোথায় রেখে এলেন? নিয়ে আসুন এখানে।" তখনকার ঘরের যে ব্যবস্থা ছিল তাতে রাস্তার থেকে দেখা সম্ভব হত না। আমার কাছে ঐ প্রথম একটা বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হয়েছিল। যাবার অনুমতি পেয়ে সানন্দে ওঁকে অনুসরণ করছি। ঘরে ঢুকে সাধুজীর দর্শন পেলাম এবং কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়িয়ে দেখছি আর দেখছিই। কি সুন্দর তাঁর স্বাস্থ্য, প্রসারিত বক্ষ, অপূর্ব সেই নয়নের দীপ্তি এবং সৌম্য কান্তি যেন আমাকে দিশেহারা করেছে। সে দৃশ্যের কথা গুছিয়ে লিখতে পারব না, শুধুই বলতে পারি সে এক মনোমুগ্ধকর অবস্থা। লক্ষ্য করলাম, আমার আপাদমস্তক কিছু দেখলেন। আমাকে চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি জানবার আছে?" সুধীরদার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ আমি, কিছুতেই কিছু বলতে রাজী নই। আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কিছুটা অনুযোগের সুরেই বললেন – এখানে তো লোকে আসে কোন কিছু বক্তব্য নিয়েই। দু'একটা প্রশ্ন করুন – উত্তর পাবেন। আমি আপনাকে অভয়

দিচ্ছি। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুধীরদা ঝড়ের বেগে আমার হয়ে বলে ফেললেন, "কি আবার চাইবে? টাকা পয়সা হবে কিনা, তাছাড়া ও একটা বই করেছে, সেটা বিক্রী হবে কিনা।" জবাব দিলেন "হবে, সব হবে।" আমি কিন্তু এক অস্বস্তিকর অবস্থায় আছি এই ভেবে যে, আমার সমস্যা বা চাওয়া পাওয়ার ব্যাপার – উনি কি করে বলেন? অগত্যা সায় দিয়েছিলাম। বেলা তখন প্রায় সাড়ে ১১টা হবে। সুধীরদা বললেন, "ওর এখন খাবার সময় হয়ে গেছে। চল, এখন যাই।" সুতরাং চলেই আসতে হল। কিন্তু কথার ফাঁকে আমি জেনে নিয়েছিলাম, দুপুরে এখানে এলে তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা। উত্তর পেয়েছিলাম, আমার ইচ্ছা থাকলে চলে আসতে পারি। কারণ তাঁর "আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই।" এ কথাকে আমি কিন্তু সম্মতি বলেই ধরে নিয়েছিলাম। সুধীরদার কথা শোনার অবকাশ হয়নি।

রাস্তায় বেরিয়ে সুধীরদাকে বললাম, "খেয়েদেয়ে আসুন না একবার আমাদের বাসায়। একসঙ্গে এখানে আসা যাবে।" জবাবে জানালেন, খেয়ে তাঁকে একটু বিশ্রাম করতে হবে। পরে একদিন আসা যাবে। মনে মনে খুবই উৎফুল্ল হয়েছিলাম – একা আসতে পারব ভেবে। হৃদয়ের মধ্যে কি যেন একটা অজানা আলোড়ন হয়ে যাচ্ছে। কেবল একই চিন্তা – কখন সেখানে পৌঁছব। বাড়ী ফিরে তড়িৎ গতিতে স্নান খাওয়া সেরে ছুটে ছিলাম শ্যামবাজার অভিমুখে।

এসে দেখলাম উনি বসে কি লিখছেন। আমাকে দেখে বসতে বললেন। নিঃশব্দে বসে আছি। কখনও উনি কথা বলছেন আগন্তুকদের সঙ্গে। কেউ বা কথা হলে চলে যাচ্ছেন, আবার নতুন করেও কেউ আসছেন। বসে বসে ভাবছি কত কি! কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিনি। তাঁর অতি অমায়িক ব্যবহার, শান্ত পরিবেশ ও মিষ্ট ভাষা লক্ষ্য করে যাচ্ছি। এঁর কাছে নিজেকে খুলে ধরতে মন চাইছে। আবার পরমুহূর্তেই ভাবছি তিনি আমাকে আপনার করে নেবেন তো? মন চাইছে পরিচয়ের মাধ্যমে ঠিক করে নিতে। কিন্তু কথা বলার তো সুযোগ হচ্ছে না। কি জানি হয়ত কিছুই বলা হবে না আজও। সব মিলিয়ে যেন আমার অস্বস্তির মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়ে দিচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা বসে বসে একখানা দেশ পত্রিকার পাতা উল্টে যাচ্ছি মাত্র। এইভাবে সময় অতিবাহিত হতে লাগল। সুধীরদার কাছে ওঁর একটা সাধারণ পরিচয় ও কর্মধারার সূত্রও জেনেছিলাম পূর্বেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, যদিও তখনও আমি তাঁকে

দেখিনি। বিভিন্ন ভাবনার মধ্যেও ভাবছি যে সাধুজী তো এখানে থাকেন সারাদিন। বাড়ীতে বৌদিরা থাকেন, কেমন করেই বা এঁদের চলে। কেই বা এঁদের সংসারের তত্বাবধান করেন – ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশেষে সন্ধ্যার দিকে সব লোকজন চলে গেলে দাদা আমার দিকে ঘুরে বসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি এখানে এসেছি। কিই বা প্রয়োজন। এবং সেই তখন থেকে বসে আছি কি উদ্দেশ্যে? বললেন, "আমার বা আমার সংসার কিভাবে চলে সে আপনি কি করে বুঝবেন?" বেশ উত্তেজিত স্বরেই বলেছিলেন। এই কথা শোনার পর মানুষ স্তম্ভিত না হয়ে পারে? জবাব আমার যেন এসে গেল। বললাম, "আমি তো আপনার কাছে অনুমতি একরকম পেয়েই এখানে এসেছি। আমি কোন কিছুই চাইনি। বসে আছি আপনার সঙ্গে কথা বলব ভেবে। আমার বসে থাকা যদি আপনার বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে বলে দিন, আমি চলে যাই। আমি জ্ঞানতঃ কোন ভাবেই আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করি নাই। চুপ করে বসে আছি মাত্র।" আবার উচ্চারণ করলেন, আমার আবাহনও নেই, বিসর্জন ও নেই।

মনের মধ্যেকার ঐ কথাগুলো কে ওঁকে বলে দিল, একেবারে হুবহু যা যা মনে এসেছিল! মনে হতে লাগল ইনি অসাধারণ এবং আমাকে জানতেই হবে এঁর মধ্যে অলৌকিক শক্তি আরও কতখানি অন্তর্নিহিত রয়েছে।

ক্রমশঃ তাঁর উত্তাপ কমে এল এবং আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন ও নানা উপদেশাদি দিলেন। শেষে জানালেন, "আমি এতক্ষণ আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম। দেখলাম সাধনার পথে অগ্রসর হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমার কথা মত চললে অনেক কিছুই হবে। আবার এমন অনেক কিছুই হয়ত চাইবেন– যার অনেকটা পাবেন, আবার কিছু হয়ত পাবেন না। সেজন্য মন খারাপ করলে চলবে না। তবে বলবেন সবই, যা কিছু করবার তা আমার ইচ্ছায় হবে।"

সমস্যাসঙ্কুল চিত্ত অনেক কিছুরই প্রয়াসী হবে – তাতে নিজেকে জড়াব না ঠিক করলাম। ওঁর কাছে শুধুই নিবেদন করব। উনি যা ভাল বোঝেন করবেন। যা হবে না তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ওঁকে বিরক্ত করব না। ব্যতিক্রম কখনও যে একেবারে হয়নি, তা হয়ত বলা যাবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীতি মানার চেষ্টা করেছি। পরবর্তীকালেও আমার মনের এই অবস্থাই বজায়

রাখার চেষ্টা করেছি। যার জন্য দাদা মাঝে মধ্যেই বলতেন, "মন্ত্র পড়ার মত ও আমার কাছে বলে যায় সব, এই ভেবে, যা কিছু করবেন, দাদাই আমার হয়ে করবেন।" তাঁর অন্তিম সময় পর্যন্তও ঐ ধারণাই পোষণ করে গেছি। দাদার নির্দেশ ছিল আমার কাছে বেদবাক্য। অজ্ঞানবশতঃ কখনও কখনও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকবে, সেজন্যও তাঁর উদ্দেশ্যেই ক্ষমা ভিক্ষা করব। ভুল তো জীবনে অসংখ্যই করেছি। যখনই কোন বাইরের উত্তাপ স্পর্শ করেছে, অমনি দাদার ছত্রছায়ায় এসে লুকিয়েছি। তবু সমস্ত আঘাতকে প্রতিহত করতে যে ব্যক্তিগত সাধনার প্রয়োজন ছিল সেদিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেটা দাদার কোন দোষ নয় –আমার এই অপদার্থ জীবনের ব্যর্থতা।

এই সৎসঙ্গ করার ফলে অসংখ্য রকমের ঐশ্বরিক বিভূতি আমার বোধ গোচরে এসেছে। হৃদয় নিংড়ে ক্ষণেকের জন্য আস্বাদনও করেছি।

দাদা বলতেন, তাঁদের কখনও কখনও ঈশ্বরের বিভূতি ক্ষেত্র বিশেষে দেখাতে হয়। এক কথায় বলতে দাদাকে পেয়ে আমার জীবন হয়েছিল ধন্য। সে কৃতজ্ঞতা আমি মনে মনে আজীবন বহন করে নিয়ে যাব। তাঁর কাছে আমার ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না। এঁদের ঋণ পরিশোধ করা যায় না। তবে আজীবন তাঁর স্মরণ মননের দ্বারাই যেটুকু সম্ভব জিইয়ে রাখা। তার দ্বারা যদি কিছু লাভ করা যায় – সেই হবে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক। দাদা চেয়েছিলেন অন্তরের নিভৃত কক্ষের আবর্জনা পরিষ্কার করে, সেখানে দিব্য আলোকবর্ত্তিকা স্বেলে দিতে। বিনিময়ে তাঁর নেবার মত জিনিষ যথা প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরানুরাগ জন্মান। তাও সম্ভব হয়নি। আমরা তাঁর কাছে কেবল পেয়েইছি আর ভোগ করেছি। আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে দিতে পারিনি কিছুই। সেজন্য নতজানু হয়ে ঐ আত্মার উদ্দেশ্যে ক্ষমাভিক্ষা জানাই। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা, পার্থিব লেনদেন বা কেনাবেচার নয়। সেটা চিরকালের, শরীর অসুস্থ থাকার কারণেই তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত কমাতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাসে ভীড়ে চাপতে খুব অস্বস্তি বোধ করি। এছাড়াও একটা কারণ আছে। শ্যামবাজারে যেভাবে যাতায়াত করতাম নিঃসঙ্কোচে, সেভাবে বাড়ীতে যাওয়া চলে না। সেখানে অযথা ভীড় বাড়ানোয় যেন মন চাইত না। বাড়ীতে ওঁর পূর্ণ বিশ্রামের জন্যই পড়ে থাকা। ভাবতাম তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠলে আবার শ্যামবাজারে সবাই মিলিত হব। মহাকাল বোধহয় তাতে মুচকি হেসেছিলেন। সে দুঃখ মনের মধ্যেই রয়ে গেল।

প্রথম দেখার পর রোজই প্রায় ওঁর কাছে শ্যামবাজারে যেতে লাগলাম। ওখান থেকে যখন ফিরতাম মন অহেতুক আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকত। কত উপদেশ ও বাণী তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হত, আমরা যারা উপস্থিত থাকতাম, তাদের উদ্দেশ্যে। কখনও কখনও একাও থাকতাম। প্রসঙ্গক্রমে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম যে তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন কিনা। জবাব এল – হ্যাঁ, আরও দু'মাস আগে থেকেই। আপনি আসতে দেরী করেছেন। দুর্বোধ্য মনে হওয়ায়, প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা সাধনলব্ধ পথে ঊর্দ্ধ চক্রে গিয়ে প্রবেশ করলে, তাঁদের কারো কারো প্রতি কিছু করণীয় কর্তব্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। "তাই প্রথম যখনই আমার সামনে আপনি এলেন, তখনই আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে মিলিয়ে নিলাম।" পূর্বেই একথা বলেছিলেন, যদিও তখন তার অর্থ বুঝিনি। পরে, আরও জানালেন যে তিনি ছাড়া আর কেউ কিছু আমার জন্য করতে পারবে না। পূর্ব জন্মেও আমি তাঁরই ছিলাম এবং তাঁর দ্বারাই আমার মুক্তি হয়েছিল। "আর এ জন্মে তো দেখছেনই, কোন কষ্ট করতে হল না, ঘুরে ঘুরে গুরু খুঁজে বেড়াতে হ'ল না, অনায়াসেই তা পেয়ে গেলেন। গুরু জন্মজন্মান্তরের এবং পূর্বনির্দ্ধারিতই থাকে।" ঔৎসুক্য বশতঃ বলেছিলাম আমাকে সেই জন্মের, সেই অবস্থা দেখান যায় কিনা। আমাকে কথাও দিয়েছিলেন যে দেখান যাবে পরে একদিন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম এজন্মেই হবে তো? "হ্যাঁ হবে–এমন জায়গায় আপনাকে ছেড়ে দেব যেখানে গেলে সব আপনার মনে এসে যাবে, কোথায় আপনি খেলতেন, কাদের ঘরে জন্মেছিলেন – যাদের ছিল জলে এবং স্থলে একাধিপত্য। আমার স্থানই বা কোথায় ছিল, সব কথাই একে একে আপনার মনে পড়বে ইত্যাদি" – এরূপ বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ আশা আমার পূরণ হয় নাই। ওঁর শরীরের ওই অবস্থা দেখেশুনে আর কখনও কিছু বলি নাই। তবে ঐ কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমার অন্যান্য ভাইয়েরাও কি সবাই পূর্বজন্মেও আপনার কাছেই ছিল? দাদা বলেছিলেন–তা নয়। আপনার দাদা প্রণববাবু ও আপনি একই জায়গা থেকে এসেছেন – এবং আমারই। প্রশ্নবানে জর্জরিত করে বলেছিলাম – দাদা ত এখনও আসেন নি আপনার কাছে। বরং তিনি ত আপনাকে গুরু মনে করায় আমাকে নানাপ্রকার কটুবাক্য ও টিটকারি প্রভৃতি দেন লোকের কাছে। জানালেন – সেও আসছে, একটু অপেক্ষা করুন দেখতে পাবেন এবং সেদিন থেকে আপনার প্রতি তার ব্যবহার অপূর্বরকমে বদলে যাবে। দাদা যা বলেছিলেন তার এক বিন্দুও মিথ্যা হয়নি। তার সাক্ষী আমি ও আমার পরিবারবর্গ।

এরও পরে হঠাৎই একদিন এই গণ্ডমূর্খকে পড়তে এগিয়ে দিলেন কয়েকখানা শ্রীঅরবিন্দের এবং শ্রীমার বই। এতে আমি প্রমাদ গণলাম। যে লোক ধর্মের অ, আ, ক, খ জানে না–তাকে কিনা পড়তে দেওয়া হল ধর্মের বই? দাদার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য তো বিপদ আপদ থেকে যদি পার হওয়া যায় – তার চেষ্টা করা। বই দিয়ে কি হবে? ঐ ধরণের বিশেষ করে। শ্রীঅরবিন্দের অপেক্ষাকৃত সহজ বইগুলো কিন্তু পড়তে ভালই লাগত এবং সহজ পন্থা বলে মনে হত।

একবার আমার ভাইদাদার খুব অসুখ হয়। তার জীবনের আশা অনেক বড় বড় ডাক্তারও ছেড়ে দিয়েছেন। আমার আত্মীয়স্বজনও চিন্তান্বিত। অনন্যোপায় হয়ে office–এর কাজ বন্ধ করে দুপুরবেলায় পালিয়ে এলাম শ্যামবাজারে। ঘটনা বলতেই জ্বলে উঠলেন। আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি যার মুখ কখনও দেখেননি, তার বাড়ীতে যাবেন না। বলতে লজ্জা নেই আমার ভেতর থেকে উচ্ছ্বসিত কান্না পেল। সে কান্না যেন থামাতে পারছি না। আমি তখন অনুরোধ করেছিলাম এই বলে যে আমাকে ত দেখেছেন বা দেখছেন, আমার ভাই হিসাবে তাকেও আমার মধ্যে দিয়ে দেখে নিন দয়া করে। এখনি গিয়ে কি দেখব জানিনা। তখনই একটা ট্যাক্সি ডাকতে বললেন, আর বললেন, "যাব শুধু আপনারই জন্য।" দৌড়ে ট্যাক্সি নিয়ে এলাম, উনিও আসনে মায়ের বিগ্রহে প্রণাম করে বেরিয়ে এলেন। ট্যাক্সিতে করে দু'জনই যাচ্ছি ১৯ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট অভিমুখে। সে রাস্তা যেন আর শেষ হচ্ছে না। ঘরে ঢুকতেই সব দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। ঘরে তখন অগণিত লোক। সবাই দেখতে এসেছে। সবাইকেই ঐ ঘর থেকে পাশের ঘরে সরিয়ে আনা হয়েছে দাদারই নির্দেশে। আমাকে বলাই ছিল যে উনি ভেতর থেকে চাইলে দরজা খুলে দেবেন। তার আগে ওই ঘরের কোন দরজা খোলা নিষেধ।

যথা সময়ে দরজা খুললাম এবং কাছে গেলাম। ভাইদাদা তখন বিড়বিড় করে বলছেন, চা, জলখাবার প্রভৃতি ভালভাবে এনে দাও। দাদা কিছু খেলেন না। শুধু এক কাপ চা দিতে বললেন। তাও আবার আমাকেই নিজের হাতে আনতে হবে। অন্যের দ্বারা এ কাজ চলবে না। চা খেয়ে ট্যাক্সি করে দুজনেই শ্যামবাজারে ফিরছি। গাড়ীর মধ্যে কথাবার্তা হল। জানিয়ে দিলেন ভাল হয়ে উঠবে এ যাত্রায়। এ ঘটনা কোন এক শনিবারের। সামনের বুধবার পর্যন্ত রোগী

সুস্থ হয়ে উঠবেন এরূপ বললেন। মঙ্গলবার রাত্রেও কিন্তু রোগের বিশেষ উপশম হওয়া লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু ভোর থেকেই দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন লক্ষ্য করা গেল। দাদা আমাকে গাড়ির মধ্যে জানালেন, আপনার ভাই আমার মধ্যে নারায়ণ দর্শন করেছেন।

পরে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে ওর আয়ু আর অল্পকাল।ঠিক করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করায় বললেন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আর কিছু করা যাবে না। স্বয়ং ব্রহ্মার হাত থেকে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে – আসতে যেটুকু সময় লাগে তার অপেক্ষায়। মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু এরপর থেকে আমার ভাইদাদা প্রায়ই শ্যামবাজারে আসা যাওয়া করতেন দেখেছি। কখনও আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং উনি আমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলেছেন। আরও একটা অলৌকিক ঘটনা আপনাদের কাছে বিবৃত করার বাসনা রাখি। আমি একবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হই। ভয়ানকভাবে শরীরে বসন্ত দেখা দেয়। ঐ সমেতই দোকানের কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিয়ে এসে কাপড় চোপড় ছেড়ে বিছানা নিলাম। দাদাকে একথা জানিয়েও ছিলাম। তিনি অভয় দিয়েছিলেন। একাগ্রচিত্তে ওঁকে স্মরণে এনে শুয়ে পড়ে থাকতাম। সমস্ত শরীর ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন আনাগোনা স্বভাবতঃই কম ছিল। তবু যারা আসত তারা নানা আশঙ্কার কথা বলে যেত। চিকিৎসার মধ্যে Homoeopathy–ই চলছিল। কিন্তু আমার শরীরে আমি জ্বালা যন্ত্রণা প্রায় অনুভবই করিনি। মাঝে মধ্যে আয়না দিয়ে দেখতাম মাত্র। মনে মনে ভাবতাম দাদা এলে একবার ভাল হত। সংক্রামক ব্যাধি – আসার কথা বলতেও সাহস হয় না। এ অবস্থায় একদিন হঠাৎ শ্রদ্ধেয়া বৌদির আগমন ঘটে। তার সঙ্গে বাক্যালাপ হওয়ার পর কি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করব জিজ্ঞাসা করায় cutlet খেতে চাইলেন। ভাল দোকান থেকে আনানো হল। বললাম অন্য ঘরে গিয়ে খাবেন। একেবারে আমার বিছানার পাশে বসেই খেলেন। আমি ত অবাক হয়ে দেখছি। উনি কেন এলেন, কার কথায়ই বা এলেন – একবারও জিজ্ঞাসা করিনি কারণ আন্দাজ করেই নিয়েছিলাম যে দাদার দ্যুতি হিসাবেই এসেছেন। নচেৎ একজন পর লোকের এই জঘন্য অসুখের কাছে নির্ভয়ে বসে থাকা আবার খাওয়া কি সম্ভব হত? কালের ধারায় রোগের উপশম এক প্রকার হল। স্নান করলাম। দুপুরে অন্নপথ্যও করলাম। কিন্তু একাকী এক পা চলারও ক্ষমতা নেই। আর

সব সময় বমির ভাব। Taxi করে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামবাজার রওনা হয়েছি। যাবার সময়ও বমি হয় হয় অবস্থা।

সেখানে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললাম। আগ্রহ সহকারে সব শুনলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঠাকুরের আসনের দিকে। হাতটা মাটিতে পাততে বললেন। আমার হাতের উপর ক্ষণিকমাত্র পা রাখলেন। তারপর বললেন এবার বাড়ী গিয়ে খেয়ে বিশ্রাম করুন। কিন্তু সেই থেকেই আমার যে সব উপসর্গ কিছুক্ষণ আগেও ছিল তা মূলতঃ অন্তর্হিত হল। বাড়ী ফিরে এসে আমি যেন শরীরে জোর পেলাম ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাড়ীতে বলেও ফেললাম যে আর ভয় নেই। সব ভাল হয়ে গেছে।

কয়েকদিন পরে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম এতবড় অসুখটা গেল। কিছুই জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করলাম না – ব্যাপারটা কি? বললেন, "আমি যে রোজ নিষুতি রাতে যেয়ে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। আপনি দেখতেই পেতেন না।" বুঝলাম সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়ার ফল।

* * *

বিচিত্র এই সংসার। এই সংসার সমুদ্র পাড়ি দিতে আসে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ঢেউ। অল্প কথায় বলা যায়, আলো ও আঁধারের লুকোচুরি খেলা। এই অন্ধকারের মধ্যে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি – তখনই দাদার অর্থাৎ শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আলোর সন্ধান সেখানেই পাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছেই নিজেকে নিঃশব্দে সমর্পণ করি। সেই থেকেই দাদার অন্তর্ধান পর্যন্ত আমার জীবনের পারাপারের কাণ্ডারী হিসাবেই মনে মনে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে এসেছি। অফুরন্ত যে স্নেহ ও ভালবাসা তাঁর কাছে পেয়ে এসেছি তার বুঝি তুলনা মেলা ভার। প্রতিদানে, তিনিও আমাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন – এটা প্রতিনিয়তই অনুভব করেছি। যখনই যেখানে বেড়াতে গিয়েছেন তখনই আমার ডাক এসেছে। সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। এখনে স্বীকার করে নিতে আমার কুন্ঠাবোধ নেই যে খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন দিনই আমার যথেষ্ট ছিল না। সে কারণে সংকোচ বোধ হওয়া স্বাভাবিক, তাতেও তিনি অভয় দিয়ে বলতেন "আপনি ত' আমার কাছে এসেছেন। চিন্তা কি?"

তাই একদিন শ্যামবাজারে আলাপ আলোচনার মধ্যে বলেছিলাম ব্যবসাটা ভাল যাচ্ছে না। ওটাকে কি একটু ভাল করে দেওয়া যায় না? উত্তরে বললেন যে, "আপনাকে বড়লোক পর্যায়ে আনতে আমার মাত্র সাতদিন সময় লাগবে এবং আপনাকে ধনী করে দিয়ে আমিও বড়লোক হয়ে যেতে পারি আপনাকে দিয়েই। কিন্তু সে অর্থ ক্ষণস্থায়ী হবে - অনেক অনর্থ তদ্বারা আসবে। সেটা আপনার এবং আমার পক্ষে কাম্য নয়। আমি অবশ্যই দেখব যাতে আপনার খাওয়া পরার অভাব না হয়।" আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম এবং জানিয়ে দিয়েছিলাম যে বড়লোক হতে চাইনা – শুধু আপনার প্রতি এই শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে যেন কাটিয়ে যেতে পারি। সেই থেকে আর কোনদিন কিছু চাইতাম না - তবে নানা দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তাঁর কানে দিতাম। করবার কিছু থাকলে, তিনি নিশ্চয়ই তা করবেন - এই আশায়। কিছু না করলেও আমার মনে কোন দাগ কাটত না। স্রেফ বলেই সেই সমস্যা থেকে মুক্ত হতাম। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি আজও বর্ত্তমান।

আমার স্ত্রীর একবার Rheumatic pain শুরু হয়। সারা অঙ্গে Joint-এ Joint-এ ব্যথা। পায়খানা প্রস্রাব করতেও বসার ক্ষমতা নেই। এরপর আবার জ্বর। প্রায় চলৎশক্তি রহিত হয়ে গেছে। ডাক্তার যথারীতি দেখান হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা জানালেন যে ভাল হতে অনেকদিন সময় নেবে, Injection প্রভৃতি করতে হবে। আমি তখন প্রমাদ গণলাম এবং অনন্যোপায় হয়ে দাদাকে একদিন বলতে বাধ্য হলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্দেশ দিলেন একদিন শ্যামবাজারে নিয়ে আসতে। ওকে না খেয়ে আসতে হবে। আমাকে বলে দিলেন ওর একেবারে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার কথা অন্ততঃ ১৪ বছরের জন্য। যতদূর মনে পড়ে ঐ সপ্তাহেই মঙ্গলবার অবশ্য নিয়ে আসতে বললেন। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হল। ঠাকুরের আসনে যেতে বললেন ওকে। ঠাকুরকে প্রণাম করতে উদ্যত হলে বললেন, "মাথা তুলবে না, কিছু দেখবে না আমি না বলা পর্যন্ত।" মিনিট খানেক পরে উঠে বাড়ী যেতে বললেন। ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলে আমাকে জানালেন এক বোতল ভাল সরিষার তেল, দরাদরি না করে কিনে নিয়ে আসবেন। তেল এনে দেওয়ার পর কি করলেন তা আমাদের জানা নিষ্প্রয়োজন। তেলের বোতলটি আমাকে ফেরত দিয়ে নির্দেশ দিলেন ওর যেখানে যেখানে ব্যথা সেখানে সেখানে যেন তেলটা মাখে। জোর না দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে বুলিয়ে দিলেই হবে। দিনে দুই বা তিনবার দিতে হবে। ২/৩ দিন দেবার পরই সম্পূর্ণ নীরোগ

হয়ে গেল। ব্যথা বেদনার অস্বস্তিই নাই অদ্যাবধি। এ ঘটনার পর ১৯/২০ বছর অতীত হয়ে গেছে। আরোগ্য লাভের পর থেকেই সে তাঁকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন আসছে।

আমার নিজেরই একবার হাঁটুর Joint-এ এত ব্যথা হতে থাকলো যে বাইরে চলাফেরা করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে আসছে। উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ডাক্তারদের মত ও ঐ একই রকম, যেমন পূর্বের ঘটনায় দিয়েছি। একদিন ফেয়ারলি প্লেস-এ Railway Office-এ একটা জ্রুরুরী কাজে যেতে হয়েছিল। দোতলায় উঠতে মনে হচ্ছিল যে Joint-এর হাড়গুলি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। সে কি অসহ্য যন্ত্রণা। আমার চোখ দিয়ে জল এসে গেছে। এর আগে পর্যন্ত রোজই দাদার কাছে যাই কিন্তু বলব বলব করে ভুলে যাই - আর বলা হয় না। কিন্তু ঐদিনের ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মনে মনে ঠিক করলাম যে ফেরার পথে ওখানে যাব এবং বিস্তারিত সব আজ বলবই। প্রয়োজন বোধ করলে প্রথমেই জানাব - তারপর তিনি যা করেন করবেন। শ্যামবাজার এসে ওঁর ঘরে ঢুকে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় দাদা বলে উঠলেন, "আজ তো অনেক কথাই বলবেন বলে এসেছেন তা বলে ফেলুন।" আদ্যোপান্ত বিবরণ দিলাম এবং জানিয়ে দিলাম যে এ অবস্থায় আপনার এখানে আসাও বোধহয় অসম্ভব হয়ে আসছে, আমার Knee Joint-এ হাত বুলিয়ে বললেন "এখানে কি?" আমি বললাম "হ্যাঁ ঠিক ওখানেই।" বলে দিলেন, "যান আমার দায়িত্ব।" ঐদিনই রাত্রি ৯/১০ টায় বাড়ী ফিরছি। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনতলায় উঠে এলাম। কোন ব্যথা বেদনা যে কোনদিন ছিল মনেই হল না। সেই থেকে আজও ভাল আছি। এমন দাদাকে কি ভোলা যায়? তাই সময়ে সময়ে ভাবি এখন কোথায় যাব? যাওয়ার জায়গা যে আর নেই।

মনে পড়ে আর একবার ফৌজদারী মামলায় আমাকে ও আমার স্ত্রীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। যথানিয়মে সমন পেলাম। আমি ভূত ভবিষ্যত ভেবে দিশেহারা হয়ে গেছি। দাদার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি। এসব মামলা জীবন ভোর দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। তাই বললাম যে যদি জামিন না হয় তাহলে তো গারদে ভরে দেবে। সেখানে বিভিন্ন রকমের আসামীদের সঙ্গে থাকতে হবে। ও এসব কিছুই বোঝে না। আমার নিজের জন্য কোনই চিন্তা ছিল না। শুনে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমি feel করেছিলাম যেন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন কিছু সময়ের জন্য। কেবা আমি, যার জন্য

তিনি এত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন? পরে এক মিনিটের জন্য আমাকে বাইরে যেতে বললেন সম্যক ঘটনা সম্যক ঘটনা নিজে দেখে বা জেনে নেবেন বলে। বেরিয়ে এসে বললেন – জামিন হবেই। যদি কোনও কারণে নাও হয়, কোন জায়গা থেকে ওঁকে Telephone সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। বুকে অনেকটা ভরসা এলো – প্রায়ই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। পরের দিন কোর্টে গিয়েই Bail Bond প্রস্তুত করিয়ে রাখলাম, কারণ দেরী হলে সাময়িক কিছুক্ষণের জন্যও হাজতবাস ঘটবে। ম্যাজিস্ট্রেট সব শুনে এককথায় Bail হয়ে গেল। Bail Bond ও place হয়ে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যে কোর্ট থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আমি civil suit শুরু করে দিলাম অপর পক্ষের ভূয়া মামলা ধরবার জন্য। ওরা বড় Solicitor Attorney দিয়েছে। এদিকে টাকার তো জোর নেই। এক একদিন বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ আমাকে ধরাচ্ছে। এরপর ঐসব কাগজপত্র নিয়ে আবার দাদার সন্মুখে হাজির হতেই হল। মনে পড়ে, অনুরোধ করেছিলাম মামলায় শেষ পর্যন্ত আমি জিতব কিনা একটু দয়া করে দেখে দিতে। রাজী হয়ে বললেন একটু বাইরে যেতে। বেরিয়ে এসে জানিয়েছিলেন, "আমি যা দেখলাম, তাতে জয় আপনারই হবে"। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। বিরোধী পক্ষ এসে মিটিয়ে গেল। ঋষিবাক্য মিথ্যা হবার নয়।

এভাবে কখনও প্রত্যাশিত কখনও অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্য দিয়ে কত যে অলৌকিক ঘটনার উন্মোচন করেছেন আমার সন্মুখে, সে ছোটই হোক, বা বড় কিছুই হোক, তার বুঝি ঠিক ঠিকানা নেই। আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবতাম যে উনি তো আমার কাছে জানবার কোনও আগ্রহই প্রকাশ করছেন না সে ব্যাপারে। এমন তীব্র Personality নিয়ে থাকতেন যাতে আমি ভয় পেতাম তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে। সময়ে একদিন কিন্তু বলেছিলাম, "দাদা, আপনি আমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করে জানতে চাননি কেন?" উত্তরে জানিয়ে দিয়েছিলেন ওগুলো আমার জানার কোন প্রয়োজন নেই কারণ আমার মাধ্যমে যা ঘটলো সেটা আমার জানাই আছে। তাছাড়া মা সব আমায় বলে দেন। ইচ্ছে করলে পরীক্ষা করতে পারেন। আর কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। যা ঘটত তা কেবল দাদা আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

একবার আমার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম আগতপ্রায় দোলযাত্রায় নবদ্বীপ যেতে। শুনেছিলাম ১১/১২ জন পূজারী ঠাকুর একসঙ্গে মহাপ্রভুর সামনে আরতি করেন। ভাবতে অবাক লাগে বহুবার নবদ্বীপ গিয়েছি, কিন্তু অমন একটা দিনে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মন্দিরে যাওয়া হয়নি। তাই ইচ্ছা

প্রকাশ করতে হয়। তিনি এককথায় রাজীও হলেন আনন্দের সঙ্গে। যতদূর মনে পড়ছে, সেবার দোলযাত্রার আগের দিন নবদ্বীপ যাওয়া হল। আমরা ৫/৬ জন বোধহয় গিয়েছিলাম। তার মধ্যে নীরেনবাবু, পরিমলদা, সুবল ভাজন অবশ্যই ছিলেন – আর কারা ছিলেন আজ আর মনে করতে পারছি না। শ্রী লক্ষ্মী বোর্ডিং-এ দুখানা ঘর নেওয়া হয়েছে। একটা ঘরে দাদার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে – আর একখানা অপেক্ষাকৃত বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ফরাস পাতা আছে। আমাদের থাকার কোনই অসুবিধা হয় নাই। পরেরদিন দাদা বললেন, "খেয়েদেয়ে চলুন মায়াপুর দেখে আসা যাক।" আমি বলেছিলাম, "সন্ধ্যার আগে ফিরে আসা যাবে কি?" সে ব্যাপারে দাদা অভয় দিয়েছিলেন এবং যেতেও হয়েছিল। আমার কিন্তু মন পড়ে আছে নবদ্বীপের উক্ত উৎসবের দিকে। যাইহোক, সন্ধ্যার পর গঙ্গার ঘাট থেকে সোজা ঐ মন্দিরে চলে এলাম সবাই। এবার কয়েক মিনিট পরেই পূজার ঘন্টার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল। আমি দাদার পাশে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ওঁর অঙ্গ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছি। মনে সঙ্কল্প নিলাম- হে প্রভু, আমি আজ তোমার কাছে এসেছি, এবং তোমারই প্রিয় এক শুদ্ধ – সত্তার সংস্পর্শে রয়েছি। সুতরাং আমার বিনীত প্রার্থনা, নিঃসংশয়ে এমন কিছু নিদর্শন রেখে যাবে আমার মধ্যে, যার দ্বারা তোমার অস্তিত্বের সম্যক অনুভূতি বুঝতে পারি। এই মুহূর্তে আমার সত্তার সমস্ত মলিনতা এই পূত সত্তার সংস্পর্শে পবিত্র হোক। অব্যবহিত পরেই হরিধ্বনির আওয়াজ মন্দির চত্বরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় আমি যেন আত্মহারা হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পরেই সংবিৎ ফিরে এলে লক্ষ্য করলাম দাদা আমার পাশে নেই। কখন বেরিয়ে গেছেন আমি জানিই না। নীরেনবাবু প্রভৃতিদেরও দেখতে পাচ্ছি না। আমি যেন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। একটু পরে নীরেনবাবু এসে খবর দিলেন দাদা বাইরে অপেক্ষা করছেন, আপনাকে ডাকছেন। চলে আসুন। তখন আমার অবস্থা ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে? যেতেও পারছি না। দুটি নয়নে অজস্র বারিধারা বয়ে চলেছে। তারপর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কান্না। সেটাকে কিছুটা সংহত না করে সবার সামনে যেতেও মন চাইছে না। কিন্তু আবার নীরেনবাবু ডাকতে এসেছেন-দাদার নাম করে। কোনও রকম সামলে নিয়ে বাইরে এসে অশ্রুসিক্ত চোখে দেখলাম রাস্তার উল্টো দিকে এক বারান্দায় দাদা বসে আছেন। দাদা বললেন, "এবার হোটেলের দিকে যাওয়া যাক কি বলেন? খাওয়া দাওয়া সেরে প্রয়োজন হলে আবার আসা যাবে।" রিক্সা ঠিক হয়ে গেল। আমি সুবলকে সঙ্গে করে এক রিক্সায় উঠলাম। ওকে বেছে নেওয়ার

কারণ হল তখনও অবিরত ধারায় প্রেমাশ্রু বয়েই চলেছে। ওরা টের পাবে তাই। ভেবেছিলাম রাস্তায় যেতে যেতে ঠিক হয়ে যাবে। নিজে থেকে চেষ্টাও করছি ঐ অবস্থা পেরিয়ে আসবার – কিন্তু সে দুরাশামাত্র। অথচ একটা অব্যক্ত আনন্দের ধারা হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে এবং খুব ভালও লাগছে। এই সবে মিলে আমি যেন একটা কোনও শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে গেছি। স্মরণ করলাম আমার প্রার্থনার মূল বিষয়বস্তু। ঠিকই তো হয়েছে, স্থির করলাম নীরব থাকব, যা কিছু আসছে অনুভব করব হৃদয় নিংড়ে। তাতে যাই ঘটুক না কেন।

* * * *

হোটেলে এসে উঠেছি। জামা কাপড় ছেড়ে ঐ ফরাসের কোণে বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে রইলাম সবার দৃষ্টির অন্তরালে। সবাই শুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন সারা দিনের ক্লান্তির অবসানে। দাদা তাঁর ঘরে গেছেন। আমার মাথার বালিশ প্রেম যমুনার অশ্রু বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। ভাবছি এ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে কি দাদাকে বলতে হবে? ভেবে পাচ্ছি না। এমন সময় দাদা আমাদের ঘরে ঢুকলেন এবং আমার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ছেন। বলাই বাহুল্য বালিশটা উল্টে দিয়েছিলাম। আমার ভিতর থেকে কে যেন dictate করল দাদাকে সেবা করার জন্য। তাই চৌকিতে উঠেই দাদার পা টিপতে আরম্ভ করলাম। তাঁর পদযুগলও বাড়িয়েও দিয়েছিলেন। পা টিপতে আরম্ভ করে দিয়েছি। ১ মিনিটের মধ্যে আমার সব ভাব কেটে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেল। অলক্ষ্যে প্রণাম করেছিলাম সেদিন। ক্ষণকাল পরে দাদা বল্লেন – "পারিজাতবাবু এখন খেতে বসা যাক কেমন"? আমি জবাব দিয়েছিলাম – "হ্যাঁ, আমি হোটেল মালিককে খেতে দিতে বলে আসছি।" আমার জীবনে এমন একজন অন্তর্যামী পুরুষকে চিনেছিলাম এমনই একটি ক্ষুদ্র ঘটনার মাধ্যমে। শুধুমাত্র লক্ষ্য করেছিলাম, কিয়ৎক্ষণ উনি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, আমিও ওঁর দিকে চেয়ে রয়েছি। তাঁর বিশালতার পরিমাপ করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা কিন্তু এত যে ঘটনা ঘটে গেছে তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেন নি। একমাত্র নীরেনবাবু বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন এরূপ শুনেছিলাম। এরপর কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর কখনও তাঁর সঙ্গে কথা হয় নাই।

"কি পাইনি তারই হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী," প্রয়াত দাদার কাছ থেকে যা পেয়েছি তারই হিসাব মেলাবার এই প্রয়াস মাত্র। পাপ তো ছিল অসংখ্য যা একটা জীবনে শেষ হওয়া অসম্ভব। যা পাওয়া গেল না তা হয়ত আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। মোট কথা আমার ক্ষেত্রে যা উনি

দিতেন সেটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, নিজের ইচ্ছায়। চেয়ে নেওয়ার মত প্রবৃত্তি আমার প্রায় ছিলই না। পেয়েছি যা, তাও যেমন সংখ্যায় অনেক, আবার না পাওয়ার একটি বেদনা উল্লেখ না করেও পারছি না। দাদা তখন অসুস্থ কিছুটা। শ্যামবাজারে যাতায়াতও সাময়িক বন্ধ বা irregular ছিল। ঘটনাটা ছিল আমাকে পূর্বজন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল করা। ঐ জন্মে কেমন ঘরে আমি এসেছিলাম, কোথায় থাকতাম, খেলা করতাম, ইত্যাদি ইঁত্যাদি। ওই জায়গায় আমাকে পৌঁছে দিলেই নাকি আমার স্মৃতিতে সব এসে যাবে এবং সব কিছুই জানতে পারব। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য তখন ঠিক না থাকায় আর ওটা দেখাবার অনুরোধ জানাতে পারিনি। এবং ঐ জন্মেও নাকি দাদার হাতেই আমার মুক্তি হয়েছিল। "তখন দেখবেন কি অবস্থায় এই দাদা কি Role play করতেন সেখানে।" কিন্তু ওটা আর আমার ভাগ্যে দেখা বা অনুভব করা হয়নি। যেভাবে একরকম আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে এনে পুত্রাধিক স্নেহ মমতার অঞ্চল দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলেন আমাকে, সেটা অবর্ণনীয়। কালীপূজার খাটাখাটুনীর পরদিন দুপুরে শ্যামবাজারের ঐ হলঘরে শুয়ে কোন এক অবচেতন মুহূর্তে শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙলে দেখি চাদর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছেন যাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। লজ্জায় অধোবদন হয়ে রয়েছি কিছু সময়। উনি আমার কে? এত স্নেহমাখা ভালবাসার উৎস কোথা থেকে? উত্তর নেই।

কোনো এক দোলের দিন দুপুরের পর শ্যামবাজার গিয়েছি। যাওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসা করে বসলেন সেদিন কি খেয়েছি। দোলের দিন বাজারে যাওয়া সম্ভব নয় বলে আমাদের বাড়ীর সামনেই মাংসের দোকান থেকে মাংসই সহজলভ্য বলে নিয়েছি। সে যা হোক ওঁর কাছে তো কখনও মিথ্যা কথা বলি না জ্ঞানতঃ। তাই ঠিক ঠিক করে সব বললাম। শুনে তো রাগান্বিত হলেনই, বল্লেন-"আর কখনও বিশেষ বিশেষ দিনে মাংস খাবেন না, কারণ ঐ সব খাওয়াতে পাপের বোঝা বাড়াচ্ছে মাত্র এবং সেগুলো আমার উপর এসে বর্ত্তাচ্ছে। তাছাড়া যে বংশ থেকে এসেছেন তাঁরা শক্তির উপাসক হলেও বৈষ্ণবপন্থী। তাঁরা এ সব অনাচার সহ্য করতে চাইবেন না।" কথা দিয়েছিলাম আর কখনও এমন অন্যায় হবে না।

সেই থেকে ভাবতুম যে ওঁর সামনে আসামাত্র ভাল, মন্দ যাই করি না কেন, নিশ্চিতভাবে তা তিনি বুঝতে পারেন। অনেক সময় তাঁর অভিব্যক্তি হত, আবার কখনও কখনও অপ্রকাশিতই থাকত।

আর একবার মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। কিন্তু ভুল করে দোতলার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। সেখানে আমার এক আত্মীয়া দিদি, খুব সঙ্গীন

অবস্থায় দিন গণনা করছেন। আয়া রাখা হয়েছে তার জন্য। দাদাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম – তা হলে তাকে তো আপনার দেখা হয়ে গেছে। এখন তাহলে আপনি বলতে পারেন ঐ রোগী কি ভাল হবেন না মারা যাবেন? সেক্ষেত্রে মৃত্যুর তারিখটা জানতে পারলে ভাল হত। উত্তর দিয়েছিলেন–"আগামী চতুর্দশী (বোধহয় ১২/১৩ দিন পরে) পার হয় কিনা দেখুন।" নিখুঁত ছিল সেই ভবিষ্যৎ বাণী। ঐ চতুর্দশীর দিন ১০/১১ টার সময় office-এ বেরোচ্ছি জামাকাপড় পরে। খবর হল শ্বাস উঠেছে জোরে জোরে। নীচে দেখতে গেলাম। Pulse ধরে যা বুঝলাম সব শেষ। ডাক্তারও ডাকা হল। তিনিও ঐ জবাব দিয়ে গেলেন।

তাঁর সংসারের সম্বন্ধে সময় সময় যা বলতেন, তাও ব্যক্ত করার অবকাশ রাখে। বৌদি ও বাপীর সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন তা অপ্রকাশিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। আমাকে তিনি একদিন বলেছিলেন–"বাপীও তৈরী হচ্ছে। সে এখনই গীতা পাঠ না করে জলস্পর্শ করে না।" অমনি জিজ্ঞাসা করি – সেও কি আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করবে? উত্তরে জানিয়েছিলেন–"ও অনেককেই Light দেবে।" শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। গুরুদেবের পুত্র আধ্যাত্মিক জীবনে পদার্পণ করে ক্রমশঃ উন্নততর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে এতে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হবার কি থাকতে পারে! সে নিজেকে উন্নত অবস্থায় তুলে ধরবে তাদের সামনে যারা তার সঙ্গ চাইবে। একথা শোনার পর আমার বুকটা যেন প্রশস্ত হয়েছিল।

বৌদির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় জানিয়েছিলেন–"ওর নিজস্ব শক্তি না থাকলেও সে আমার আলোয়ই আলোকিত।"

নানা ধরণের অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ব্যক্ত করা যেতে পারে, যা তিনি আমার ও আমার পরিবারবর্গের মধ্যে ঘটিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় ওগুলির আধিক্যের প্রয়োজনীয়তা কি? সার্থকতাই বা কোথায়? একজন সিদ্ধ যোগীর পক্ষে ঐ সমস্ত টুকিটাকি কাজ করা অসম্ভব কিছু নয়। আমাকেই দাদা কোন এক মুহূর্তে বলেছিলেন। "আপনি চান তো দুই শতাধিক অলৌকিক ঘটনা এক্ষুণি দেখান যেতে পারে। আপনি চেয়ে দেখুন।" আমি কিন্তু তা দেখতে অস্বীকার করেছিলাম। যাই হোক আমার মনে হয়, ওসবে এঁদের ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট। মন্ত্রে দীক্ষিত হবার পরই আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে ইষ্ট দর্শন ও সামান্য অনুভূতি আসে, তার দু' একটা ঘটনা চাইলে পরে কোথাও ব্যক্ত

করা যেতে পারে। কারণ, সেগুলো ব্যক্তিগত কোন সুখ ঐশ্বর্য্যের বা ভোগবিলাসের অন্তর্গত নয়। কেবলমাত্র দাদারই কৃপায় হয়েছিল সাময়িক অনুভূতি।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

দাসত্বের কাল **সুনন্দন ঘোষ**

এখন দাসত্বের কাল, অর্জুনের ক্লান্ত হাতে ওঠেনা গাণ্ডীব,
সম্ভোগে আরক্ত চোখ, রাজপথে হেঁটে আসে সতীহীন শিব।
ঊর্ণনাভ জাল বোনে, মস্তিষ্কের সুদুর্গম কোণে
লুকোচুরি খেলে মৃত্যু – মৃদু হেসে – স্বপ্নে জাগরণে।
ঠোঁটে হাসি, চোখে ঈর্ষা, হৃদয়ে সন্দেহ,
প্রেমহীন- এটা কি জীবন – বলো –শুধু খুঁজে দেহ?
এখনো হারিনা তবু, বাঁধিনা মৃত্যুর ঘরে বাসা –
যতদিন তুমি আছো, হৃদয়ে আমার ভালবাসা।

DO NOT COPY